হযরত
সালমান
ফারসী

হযরত সালমান ফারসী

রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহু

আবুল খায়ের মুসলেহউদ্দিন

ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

হযরত সালমান ফারসী (রা.)

আবুল খায়ের মুসলেহউদ্দিন

ই.ফা.বা. প্রকাশনা ঃ ৪৭৭

ই.ফা.বা. গ্রন্থাগার ঃ ৯২২'৯৭/আবু-হ

প্রথম প্রকাশ ঃ মে, ১৯৮১ ইং

দ্বিতীয় প্রকাশ ঃ সেপ্টেম্বর ১৯৮৪ ইং

তৃতীয় প্রকাশ ঃ

ভাদ্র ১৩৯৪

মহররম ১৪০৭

সেপ্টেম্বর ১৯৮৭

প্রকাশক ঃ

অধ্যাপক আবদুল গফুর

প্রকাশনা পরিচালক,

ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

বায়তুল মুকাররম, ঢাকা-২

অঙ্গ সজ্জা ঃ

মুহাম্মদ আইউব আলী

মুদ্রণে ও বাঁধাইয়ে ঃ

ইসলামিক ফাউণ্ডেশন প্রেস,

বায়তুল মুকাররম, ঢাকা-২

মূল্য ঃ বার টাকা মাত্র

ই. ফা. বা. ৮৭-৮৮—প্র/৪১৫৭—১০,২৫০—১৮.৫.৯৪/৪.৯.৮৭

HAZRAT SALMAN FARSI [R.] : Written by Abul Khair Muslehuddin, Language Bengli (Life sketch of Hazrat Salman Farsi (R.), published by Prof. Abdul Gahfur, Director Publications, Islamic Foundation Bangladesh, Dhaka. September 1987

Price : Tk. 12·00 ; U. S. Doller 1·00

প্রকাশকের কথা

পারস্যের অধিবাসী হযরত সালমান ফারসী (রা.)। তিনি সত্য সুন্দর জীবনের সন্ধানে এক অতৃপ্ত আশা নিয়ে কিভাবে পাগলের মত এক অঞ্চল থেকে অন্য অঞ্চল, এক দরজা থেকে অন্য দরজায় ছুটে বেড়িয়েছেন; পরিশেষে কিভাবে ইসলামের বাণীবাহক হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর হাতে ইসলামের হাউজে-কাওসার পান করে পিপাসিত অন্তরাত্মাকে শীতল করেছিলেন, কিভাবে দুঃখকষ্টের পাহাড় ডিঙ্গিয়ে অবশেষে সাহাবী হযরত সালমান ফারসী (রা.)-তে পরিণত হতে পেরেছিলেন, তারই চমকপ্রদ কাহিনী লেখক জনাব আবুল খায়ের মুসলেহউদ্দিন এ বইটিতে বর্ণনা করেছেন।

বইটি পড়ে ছোট ছোট ছেলে-মেয়েরা আনন্দ পাবে বলে আশা করি।

আগুন পূজায় সত্য নেই	৭
সত্য পথের সন্ধানে	১১
সত্য ধর্ম কি?	১৬
মহামানবের সন্ধানে	২১
যাকারিয়া ও সালমান (রা.)	২৫
সামাউনের কবলে সালমান (রা.)	৩০
মহানবী (স.) ও সালমান (রা.)	৩৭
সালমান (রা.)-এর মুক্তি	৪৪
ইহুদীর নতুন শর্ত	৪৫

উপহার

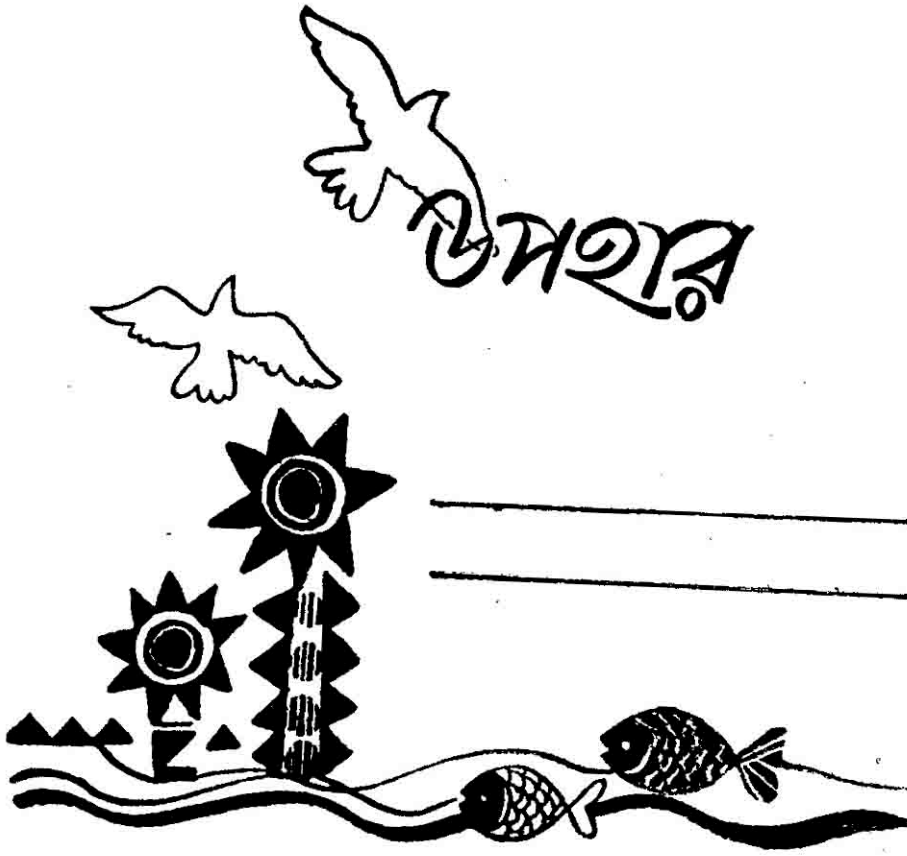

উৎসর্গ

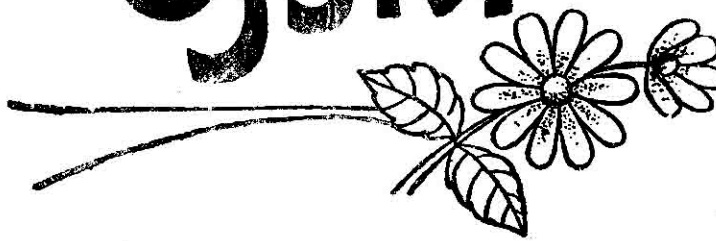

মরহুম আব্বার স্মৃতির উদ্দেশ্যে

আগুন পূজায় সত্য নেই

পারস্য দেশের ছোট্ট শহর রামহরমাজ। শহরের কাছাকাছি জোনায়ের নামক এক এলাকা। পাতলা বসতি। সারা এলাকা জুড়ে গম, যব আর জোয়ারের ক্ষেত। মাঝে মাঝে ছোট বড় খেজুর গাছ। ঝরনার ধারে চরে বেড়াচ্ছে উটের পাল। লেজ তুলে কাঁটা ঘাস খাচ্ছে ছাগল আর ভেড়ার দল।

হালকা সবুজে ঘেরা বসতি পার হলেই বিশাল মরুভূমি। ধূ ধূ করছে রোদ ঝলসানো বালুকারাশি। সাইমুম ঝড়ে কখনো কখনো গোটা এলাকা কালো হয়ে যাচ্ছে সুরমাখচিত রাতের মত। পথ ফেলছে হারিয়ে উটের পিঠে দূরযাত্রী কাফেলার পর কাফেলা।

জোনায়ের এলাকার গণ্যমান্য সরদার বুদর খাশাঁ। গোত্রের লোকের তাঁকে শ্রদ্ধা করে পারস্য সম্রাটের একজন নিকটতম আত্মীয় হিসেবে। বুদর খাশাঁ ও তাঁর গোত্রের লোকেরা অগ্নি-উপাসক বা মাজুমী। আগুনের বিরাট কুণ্ড জ্বালিয়ে পরমভক্তি ভরে তাঁরই পূজা করে তারা।

বুদর খাশাঁর একমাত্র পুত্র মাহবা। মাহবা তার ফার্সী নাম। পরবর্তীকালে হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর সাহাবীরা মাহবার নতুন নাম রাখেন সালমান ফারসী।

হযরত সালমান ফারসী (রা.)

ছোট্ট ছেলে সালমান পিতামাতার স্নেহের ধন। সারাদিন আদর-যত্নে ছেলের মন ভরপুর করে রাখেন। ছেলে চোখের আড়াল হলেই অস্থির হয়ে ওঠেন। পাছে সে বাইরের মন্দ বালকদের সংগে মিশে নষ্ট হয়। সেই ভয়ে বুদর খাশাঁ সালমানকে বাড়ির বাইরে যেতে দেন না। ঘরেই তার পড়াশুনার ব্যবস্থা। পিতার সাথে সেও রোজ অগ্নিপূজায় শামিল হয়। পিতার ইচ্ছে, তার মৃত্যুর পর মাহবা হবে গোত্রের সামাজিক ও ধর্মীয় নেতা।

বাড়ির সীমানার মধ্যে বন্দী থাকলেও মাহবার মন মাঠে মাঠে আর মরু-প্রান্তরে ঘুরে বেড়ায়। কেমন যেন উদাসীন ভাব তার চোখেমুখে। সব সময় কি এক চিন্তায় তার মন যেন বিহ্বল হয়ে থাকে।

সালমান ভাবে, আগুনকে মানুষ কেন পূজা করবে? যে আগুন মানুষ নিজ হাতে জ্বালছে, যে আগুন পানির ছোঁয়া পেলে সহজেই নিভে যায়, যার দহন-শক্তি মানুষের দ্বারা পরিচালিত, তা কেমন করে মানুষের পূজ্য হতে পারে? সালমান ভাবে আর ভাবে। কিন্তু ভেবেও এর কূলকিনারা পায় না।

বুদর খাশাঁর বেশ কিছু ফসলের জমিজমা রয়েছে তার বাড়ির কাছাকাছি। সেগুলো অবসর সময়ে নিজেই দেখাশুনা করে। এক সময় একটা নতুন বাড়ি তৈরির কাজে হাত দিলেন তিনি। ফলে, মাঠে গিয়ে জমিজমা দেখাশুনা করতে আর পারেন না।

এদিকে খালি মাঠ পেয়ে ঝাঁকে ঝাঁকে পাখি এসে পাকা ফসল খেয়ে যাচ্ছে। ভেড়া-বকরীও নষ্ট করছে ক্ষেত। বুদর খাশাঁ ছেলেকে ডেকে বললেন—'মাহবা, আমি নতুন বাড়িটা নিয়ে সারাদিন ব্যস্ত থাকি, তুমি এ সময়টা ক্ষেত-খামার দেখাশুনা করো। তবে অবশ্যই সন্ধ্যার আগে বাড়ি ফিরে আসবে। নইলে আমি তোমার জন্য খুব চিন্তিত থাকবো।'

বাইরে যাওয়ার অনুমতি জুটেছে, মাহবার মনে আনন্দ আর ধরে না। খোলা আসমানের নীচে, খেজুর বাগানের ছায়ায়, ঝরনার ধারে ধারে ঘুরে বেড়াবার সুযোগ পেয়ে খুশিতে মনটা ওর পরিপূর্ণ হয়ে উঠলো।

কবীলার পথ ধরে চলতে চলতে মাহবা দেখতে পেল একটা বিশেষ ধরনের বড় বাড়ির ভেতরে ঢুকছে একদল পুরুষ ও নারী। মাহবার ভারী কৌতূহল হলো বাড়ির ভেতরটা দেখার। সবার সংগে এগিয়ে গেল সে। বাড়িটা খৃস্টানদের গির্জা, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, সুন্দর।

সাদা ধবধবে পোশাক পরা গির্জার বৃদ্ধ পাদ্রী মাহবাকে দেখে খুব আদর-যত্ন করলেন। ওকে পাশে বসিয়ে মাথায় স্নেহমাখা হাত বুলিয়ে দিলেন। তারপর পবিত্র ইনজিল কিতাব থেকে কিছু বাণী পড়ে শোনালেন অপূর্ব কণ্ঠে।

পাদ্রীর ব্যবহারে মুগ্ধ হলো মাহবা। তার মনে হলো. আগুন পূজাতে কোন সত্য নেই। যদি কোন পূত-পবিত্র ধর্ম থেকে থাকে, তবে তা এই সংসার ত্যাগী পূত-পবিত্র পাদ্রীর ধর্ম।

বাড়ি ফিরতে মাহবার সন্ধ্যা হয়ে গেল। এদিকে পিতা চারদিকে লোকজন পাঠিয়েছেন তার খোঁজে। মাহবা নির্ভয়ে পিতার কাছে এসে সত্য কথা বললো, সে পাদ্রীর গির্জায় সারাদিন কাটিয়েছে, ক্ষেতে পশুপাখি তাড়াতে যায়নি।

সে আরো বললো, বৃদ্ধ পাদ্রীর উপাসনার রীতি-নীতি ও কোমল ব্যবহার তাকে মুগ্ধ করেছে। তার মনে বিশ্বাস জন্মেছে যে, খৃস্ট ধর্মেই মানুষের মুক্তি ও শান্তি নিহিত রয়েছে।

মাহবার কথা শুনে বুদর খাশাঁ ভয়ে কেঁপে উঠলেন। তাঁর ভয় ও আশংকা হলো, না জানি পাছে একমাত্র পুত্র তাদের ধর্ম ত্যাগ করে খৃস্টান হয়ে যায়!

পিতার আদেশে পায়ে শিকল পরিয়ে মাহবাকে ঘরের মধ্যে আবদ্ধ করে রাখা হলো—যাতে সে পালিয়ে খৃস্টানদের গির্জায় যেতে না পারে।

পনেরো বছর বয়সের বালক মাহবা। বন্দী থেকে তার মন আরো বিদ্রোহী হয়ে উঠলো। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলো, ছাড়া পেলে বা সুযোগ পেলেই সে পালিয়ে গিয়ে পাদ্রীর কাছে আশ্রয় নেবে।

মাঝে মাঝে চার-পাঁচজন বন্ধু দেখা করতে আসে বন্দী মাহবার সংগে। একদিন একজন বিশ্বস্ত বন্ধুকে দিয়ে মাহবা সংবাদ পাঠালো গির্জার প্রাদ্রীর কাছে, তাকে যেন বন্দীদশা থেকে উদ্ধার করে দূরের কোন গির্জায় পাঠিয়ে দেওয়া হয়। মনে-প্রাণে সে খৃস্ট ধর্মের প্রতি অনুরক্ত। আগুন পূজায় তার আর কোন আস্থা নেই। বড় হয়ে সে ধর্মযাজক হতে চায়, আর বাকি জীবন খৃস্টান পুরোহিত হিসেবে খৃস্টের উপাসনা করে কাটিয়ে দিতে চায়।

সত্য পথের সন্ধানে

বুড়ো পাদ্রী মাহবার বন্দীদশার কথা শুনে খুব দুঃখ করলেন। ওর বন্ধুর মারফত চুপে চুপে পাঠিয়ে দিলেন একটা শিকল-কাটা কাঁচি। গভীর রাতে যখন সমস্ত বাড়ি শুমশাম, বালক মাহবা তখন আস্তে আস্তে শিকল কেটে নিজেকে মুক্ত করলো। তারপর রাতের অন্ধকারে মাতা-পিতার অগোচরে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়লো এক অজানা পথের সন্ধানে।

গির্জার বৃদ্ধ পাদ্রী মাহবাকে পেয়ে খুব খুশি। ওকে বুকে চেপে ধরে বারবার কপালে চুমু খেলেন। তাঁর সেবকদের বললেন—'ভোর হলেই বুদর খাশাঁর লোকেরা মাহবার খোঁজে সারা কবীলা

তন্নতন্ন করে ছাড়বে। সুতরাং তোমরা ওকে এক্ষুণি খৃস্টান যাজকের পোশাক পরিয়ে সিরিয়ার পথে মুর্‌শকোর পাঠিয়ে দাও।'

গাধার পিঠে চড়ে মুর্‌শকোর যাত্রা করলো মাহবা। সংগে পাদ্রীর এক ভৃত্য। পেছনে পড়ে রইলো পিতামাতা ও আপনজনদের স্নেহ-মমতা। এক অজানা সত্যের সন্ধানে চলেছে সে। চোখে তার অনন্ত জিজ্ঞাসা—কে এই বিশাল বিশ্বমণ্ডলের অধিপতি? কার নির্দেশে দিনের পর রাতের সৃষ্টি হচ্ছে? আকাশ জুড়ে পরিভ্রমণ করছে চাঁদ-সুরুজ আর গ্রহতারা! বৃষ্টিধারা প্লাবিত করছে শুষ্ক মরুভূমি! বীজ থেকে বেরুচ্ছে সবুজ গাছপালা! জন্ম নিচ্ছে মানুষ, পশু-পাখি আর অসংখ্য জীবজন্তু! অবাক দৃষ্টিতে দূর মরুপথের দিক্‌রেখার দিকে তাকিয়ে ভাবনার সাগরে ডুবে যায় তার সারা অন্তর।

এক অচেনা কাফেলার সংগে সফর করে দীর্ঘ দু'মাস পর সালমান পৌঁছলো সিরিয়ার রাজধানী দামেশ্‌ক শহরে। সেখানে গিয়ে আশ্রয় নিল লিউনুস নামে এক নামজাদা খৃস্টান পাদ্রীর আস্তানায়।

লিউনুস দিনরাত ইবাদত-বন্দেগীতে ডুবে থাকে। হাযার হাযার ভক্ত ভক্তিতে লুটিয়ে পড়ে তার পায়ে। ভক্তদের সে অকাতরে হযরত ঈসা (আ.)-এর নামে দান-খয়রাত করতে উপদেশ দেয়, আর ভক্তরা বিনা দ্বিধায় নিজেদের টাকা-পয়সা, সোনা-রূপা তুলে দেয় লিউনুসের হাতে।

বারো

লিউনুসের প্রিয়পাত্র হয়ে উঠলো মাহবা অল্পকালের মধ্যেই। তার গুরুভক্তি দেখে পাদ্রী তাকে খাস খাদেমরূপে গ্রহণ করলো। ফলে, মাহবা পাদ্রীর অন্দর মহলে ঢোকার অনুমতি পেয়ে গেল।

কিছুদিনের মধ্যেই মাহবা আবিষ্কার করলো, লিউনুস আসলে কোন সংসারত্যাগী দরবেশ নয়। সে একজন লোভী ভণ্ড প্রতারক। লোকজন তার হাতে যে টাকা-পয়সা তুলে দেয়, সে তার এক কানাকড়িও গরীবদের দান-খয়রাত করে না। বরং সমস্ত ধন-দৌলত জমা করে রাখে নিজের ভোগের জন্যে।

একদিন চুপে চুপে মাহবা লিউনুসের এক চোরাকুঠরিতে ঢুকে দেখতে পেলো, কপট পাদ্রী ভক্তদের দেয়া টাকা-পয়সা ও সোনা-চাঁদিতে ষাটটি কলস ভরে রেখেছে।

অন্তরে ভীষণভাবে হোঁচট খেলো মাহবা। তার গুরুভক্তি চরম ঘৃণায় পরিণত হলো। কিছুকাল পরে সামান্য রোগে মারা গেল সেই ভণ্ড দরবেশ লিউনুস। হাযার হাযার শিষ্য তার জন্য মাতম শুরু করলো সারা দামেশ্‌ক জুড়ে।

মাহবা ভাবলো, ভণ্ড লোকটার খোলস খুলে দেয়ার এই সুবর্ণ সুযোগ। সে টাকা-পয়সা, সোনা-রূপা ও মণি-মুক্তোর কলসগুলো সবার সামনে নিয়ে এলো। ব্যাপার বুঝতে পেরে জনগণ ক্ষোভে

ফেটে পড়লো। কবর না দিয়ে লিউনুসের লাশ ওরা শূলে লটকালো। পাথর মেরে মেরে ওর লাশটা ছিন্নভিন্ন করে দিলো।

লিউনুসের মৃত্যুর পর ইউমান্না নামে আর এক ধর্মযাজক তার জায়গায় বসলেন। মাহবা তাঁর আশ্রয়ে থেকে খৃস্ট ধর্ম-চর্চা করতে লাগলো। কিন্তু কিছুকালের মধ্যে ইউমান্নারও মৃত্যু হলো। এবার মাহবা চললেন মোসেলের জিরোম নামক এক সাধকের কাছে। এতোদিন তাঁর বয়স বেড়েছে, সত্যিকারের ধর্ম সম্বন্ধে আরো বেড়েছে কৌতূহল আর প্রশ্ন।

জিরোমের কাছে মাহবা তাওরাত, ইন্‌জিল ও অন্যান্য আসমানী কিতাব পাঠ করলেন গভীর মনোযোগের সংগে। কিন্তু এতেও তাঁর অন্তর শান্ত হলো না মোটেই। তাঁর প্রশ্নের জবাবে জিরোমের যুক্তি টিকতে পারলো না।

মাহবার মনে হলো, খৃস্ট ধর্মে গলদ রয়েছে অনেক। এক এক যাজক এক এক মতবাদের অনুসারী। তাদের গোঁড়ামি সত্যি-কারের ধর্মবোধকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে। হযরত ঈসা (আ.) আল্লাহ্‌র যে পবিত্র বাণী প্রচার করেছেন, এসব গোঁড়া পাদ্রীরা তা থেকে অনেক দূরে সরে গেছে। প্রত্যেক যাজক প্রবর্তন করেছে নিজ নিজ মনগড়া মতবাদ, আর তাদের মধ্যে লেগে রয়েছে ভীষণ রকম কোন্দল আর দলাদলি।

হযরত সালমান ফারসী (রা.)

জিরোমের আস্তানায় থাকাকালে মাহবা ফারসী সারযানা নামক এক বিদ্বান ব্যক্তির সোহবতে এলেন। তাঁর কাছ থেকে ধর্ম ও সত্য সম্পর্কে তিনি দীক্ষা নিতে চাইলেন। কিন্তু জিরোমের মত সারযানাও তাঁর যুক্তি-তর্কের কাছে হার মানলো। মন ভীষণ অশান্তিতে ভরে গেল মাহবার। একা একা মরু-ময়দানে উদ্ভ্রান্ত পথিকের মত ঘুরে বেড়াতে লাগলেন তিনি।

জিরোমের মৃত্যুর পর মাহবা হাযির হলেন ইমুরিয়া নিবাসী বাতরাস নামক এক সাধকের দরবারে। বছরের পর বছর কাটালেন তাঁর সোহবতে। কিন্তু প্রাণের অদম্য চাঞ্চল্য তাঁর বেড়েই চললো। বাতরাসও তাঁকে সত্য ও শান্তির সঠিক কোন সন্ধান দিতে পারলো না।

বাতরাসের মৃত্যুর পর মাহবার দীর্ঘ দশ বছর কাটালেন এনতাকিয়ার বিখ্যাত ধর্মযাজক বুনিফাসের আশ্রয়ে। মৃত্যুকালে বুনিফাসের চোখে-মুখে স্বীয় অক্ষমতার চিহ্ন ফুটে উঠলো। কাতর-কণ্ঠে বললেন যাজক—'মাহবা, আমি নিজেই এতকালের সাধনার পরেও সত্যের কোন সন্ধান পাইনি। আমি কিভাবে তোমাকে হিদায়ত করবো? তুমি বরং বসরা শহরের বিখ্যাত দরবেশ বুহিরার কাছে যাও। তিনি হয়তো তোমাকে সত্যের পথ দেখাতে পারবেন।'

সত্য ধর্ম কি ?

হযরত সালমান ফারসী (রা.) এখন আর পনেরো বছর বয়সের ঘরছাড়া বালক নন্। এক সাধক থেকে আরেক সাধকের দরবারে বছরের পর বছর কাটিয়ে এখন আশি বছরের বৃদ্ধ। ভগ্ন শরীর। কিন্তু চেহারায় উজ্জ্বল গৌরবর্ণের ছাপ। মুখভর্তি সাদা দাড়ি। সাধারণ দরবেশের পোশাক তাঁর গায়। চোখেমুখে এক জ্যোতির্ময় তন্ময় ভাব। যেন কোন অতল চিন্তার মধ্যে ডুবে রয়েছেন। কোন এক অজানা সত্যের সন্ধানে দেশ হতে দেশান্তরে, এক সাধক থেকে আরেক সাধকের দরবারে ঘুরে বেড়াচ্ছেন।

মাহবা একদিন খৃস্ট ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পৈত্রিক ধর্ম বিসর্জন দিয়ে ঘর ছেড়ে ছিলেন। হযরত ঈসা (আ.)-এর ধর্মের গভীরতায় আকৃষ্ট হয়ে আত্মসমর্পণ করে সংসারবিরাগী হয়েছিলেন তিনি, কিন্তু তাতে তাঁর মনের পবিত্রতা বৃদ্ধি পায়নি বরং তার বদলে অসীম দ্বন্দ্ব ও জিজ্ঞাসাই কেবল বেড়েছে। তিনি দেখেছেন, হযরত ঈসা (আ.)-এর ধর্মকে যাজকরা নিজ নিজ মনগড়া মতবাদে পরিণত ক.রছে।

এক আল্লাহ্র ইবাদত ছেড়ে গ্রীক ও রোমান খৃস্টানরা মূর্তিপূজাকে ধর্মের অংগ করে নিয়েছে। মান্ডী সম্প্রদায়

আগুন পূজাকে ধর্মের আচারে পরিণত করেছে। আর এক বিরাট দল সংসার ত্যাগ ও বৈরাগ্যকে খৃস্টধর্ম বলে চালিয়েছে। যাজকরা নিজ নিজ ইচ্ছা মত ইঞ্জিল কিতাবকে বিকৃত করেছে। ফলে, হযরত ঈসা (আ.) প্রবর্তিত তৌহীদকে উপেক্ষা করে খৃস্টানরা আল্লাহ্‌র সাথে সাথে তাকেও পূজা করতে শুরু করেছে। তারা তাঁকে আল্লাহ্‌র পুত্র বলে প্রচার করছে। আল্লাহ্‌ সমগ্র মানব জাতির প্রতিপালক স্রষ্টা। তিনি কারো পিতা হতে পারেন না, যাজকরা এ সহজ সত্যকে ত্যাগ করে তাদের নবী হযরত ঈসা (আ.)-কে আল্লাহ্‌র অংশীদারে পরিণত করেছে।

মাহবা বছরের পর বছর ধরে খৃস্টধর্মের সাথে সাথে ইহুদী ধর্মও চর্চা করলেন। কিন্তু এখানেও তিনি কোন সত্যের আলোক দেখতে পেলেন না। ইহুদী ধর্মে মূর্তি পূজা নেই সত্য, ইহুদীরা অন্য কোন সম্প্রদায় ও ধর্মকে সহ্য করতে পারে না। এরাও ধর্মীয় আচার-পদ্ধতিকে শিরক ও মুনাফেকীতে ভরে তুলেছে। হযরত উজায়ের (আ.)-কে এরা আল্লাহ্‌র পত্র বলে দাবি করেছে, প্রকাশ্যে।

আশি বছরের বৃদ্ধ মাহবা। গায়ে ঢিলেঢালা সাদা জামা। পরনে সাদা চাদর। সুন্দর সৌম্যমূর্তি। দীর্ঘ মরুপথ পাড়ি দিয়ে ক্লান্ত দেহে বসরার নিকট এক বিরাট ফল ও ফুলের বাগিচায় উপনীত

হলেন। অগুনতি গোলাপের ঝাড় সারা বাগান জুড়ে। খোশবুতে বাতাস মৌ মৌ করছে। একটা কুয়োর পানিতে মাহবা হাতমুখ ধুয়ে নিলেন। আঁজলা ভরে পান করলেন শীতল পানি। বসরাই গোলাপের সুঘ্রাণে কুয়োর পানিও খোশবুদার হয়ে উঠেছে।

বাগানের মাঝখানে বুহিরা মুনির বিরাট গির্জা। গির্জার চূড়া খেজুর গাছের ফাঁক দিয়ে উঠে গেছে আকাশের দিকে।

সন্ধ্যার কিছু পরে মাহবার ডাক পড়লো সাধক বুহিরার কক্ষে। বুহিরা তার চেয়ে অনেক বেশি বৃদ্ধ। মাথাভর্তি সাদা চুল। মুখভরা সাদা দাড়ি নাভি পর্যন্ত নেমে এসেছে। ঘরের দেয়ালে চারটি বিরাট ক্রুস চিহ্ন আঁকা।

দিনরাত গভীর ধ্যানে মগ্ন থাকেন সাধু বুহিরা। জনসমক্ষে হাযির হন না মোটেই। শুধু বছরে একটিবার তাঁর নির্জন কক্ষ হতে বের হয়ে আসেন হাযার হাযার দর্শনপ্রার্থীর সামনে। কথা বলেন না কারো সাথে। পলকহীন চোখে চেয়ে থাকেন আগত ভক্তদের পানে। তারপর আবার খাদেমদের কাঁধে ভর দিয়ে ফিরে যান নির্জন ঘরের কোণে।

অবাক হলেন মাহবা। যে মহাজ্ঞানী বছরে একবার মেলার সময় ছাড়া কারো সাথে দেখা করেন না, সে ব্যক্তি তাঁকে ঘরের

ভেতরে ডেকে পাঠিয়েছেন। মাহবা যেন আশার আলো দেখতে পেলেন। আজ এ মহান খৃস্টান পুরোহিতের কাছে হয়তো পেয়ে যাবেন সত্য পথের সন্ধান, মিটবে তাঁর ধর্ম-পিয়াসা।

বুহিরা মুনির চোখে শাণিত দৃষ্টি। দৃষ্টিতে তাঁর উজ্জ্বল জ্যোতি। তাঁর সামনে অবনত শিরে দাঁড়িয়ে আরয করলেন মাহবা—'হে মহা সাধক! আপনি আমাকে জ্ঞানের আলো দিন। আমাকে বলুন, সত্য ধর্ম কি? আমার মন অশান্তিতে জর্জরিত। বলুন, কোন্ সাধনার বলে আমার অন্তরের অস্থিরতা দূর হবে?'

চমকে উঠলেন বুহিরা সালমানের প্রশ্নে। একই প্রশ্নের উত্তাল সমুদ্রে নিমজ্জিত তিনি যুগের পর যুগ ধরে। ধর্মের গোঁড়ামি ও আচার অনাচারে সমগ্র মানব জাতি যখন নিমগ্ন, তখন রাতদিন সাধনা করে মুক্তির পথ খুঁজছেন তিনিও। তাঁর মনেও একই জিজ্ঞাসা—প্রকৃত ধর্ম কোন্‌টি।

অনেক্ষণ নীরব থাকলেন সাধক বুহিরা। তারপর ধীরে ধীরে বললেন—'ভাই, সত্যের সন্ধান আমিও পাইনি। তারই তালাশে আমি দিনরাত নির্জন কক্ষে ধ্যান করছি। আজও আলোর দিশা পাইনি। তবে, আমি মনেপ্রাণে বিশ্বাস করি, আল্লাহ্ এক, তাঁর কোন শরীক নেই। খৃস্টান যাজকরা পথভ্রষ্ট হয়ে হযরত ঈসা নবীকে আল্লাহ্‌র পুত্র বলে প্রচার করছে।

তারা ঈসা (আ.) ও ফেরেশতা জিবরাঈল (আ.)-কে আল্লাহ্‌র মতই আরাধ্য বানিয়েছে। আমি তাদের এ শেরেকী মতকে বিশ্বাস করি না। গির্জায় বাস করলেও নীরবে একমাত্র আল্লাহ্‌রই ইবাদত করি।

কথা বলতে বলতে বৃদ্ধ বুহিরা ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন। একটু থেমে আবার বললেন—'আপনি যদি সত্যের সন্ধান পেতে চান, তবে আমার মত কেবল আল্লাহ্‌তা'আলার ইবাদত করুন। তাঁর দরবারে মনপ্রাণ সমর্পণ করুন। তাতেই আপনার প্রাণে শান্তি ফিরে আসবে।'

কিছুক্ষণ নীরব থেকে সাধু বুহিরা বললেন—'তবে আশার কথা, সমস্ত আসমানি কিতাব ও দরবেশদের মতে আল্লাহ্‌ শীগ্‌গীরই দুনিয়ার বুকে তাঁর শেষ এবং শ্রেষ্ঠ নবী প্রেরণ করবেন, যিনি মানুষকে আবার তৌহীদের পথে হিদায়ত করবেন। আপনি সেই মহাপুরুষের অপেক্ষা করুন, আমিও তাঁরই জন্য ইনতেজার করছি। আল্লাহ্‌ হয়তো আমাদেরকে তাঁর দীদার নসীব করবেন।'

সাধু বুহিরার কথা শুনে চমকে উঠলেন মাহবা। তাঁর অন্তর-মনে উজ্জ্বল আশার এক ঝলক আলো বিজলির মত চমকে উঠলো। পরম কৌতূহলের সংগে তিনি জিজ্ঞেস করলেন—'কবে পর্যন্ত সে মহানবী পৃথিবীতে আগমন করবেন, সে কথা আপনি বলতে পারেন কি?'

কিছুক্ষণ ইতস্তত করে সাধক বুহিরা বললেন—'আমার ধারণা, আল্লাহ্ তা'আলা সে মহাপুরুষকে পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন। হয়তো তাঁর সাথে আমার সাক্ষাৎও হয়েছে।'

ঃ আপনি তাঁকে দেখেছেন? কোথায় দেখেছেন? আমাকে অবিলম্বে বলুন।—বিপুল উৎকণ্ঠাভরে বুহিরার মুখের দিকে চেয়ে জিজ্ঞেস করলেন সালমান ফারসী (রা.)।

মহামানব (স.)-এর সন্ধানে

ঃ শুনবেন সে কথা? তবে শুনুন বলছি।

আজ থেকে অনেক বছর আগের কথা। আপনি যে গাছের ছায়ায় আজ বিশ্রাম করতে বসেছিলেন, সেই গাছের ছায়ায় একটি কাফেলা এসে হাযির হলো। দক্ষিণ দিকে যে বিশাল মরুভূমি সে দিক থেকেই এসেছে কাফেলাটি। এমনি বহু কাফেলা আসে আমার খেজুর বাগানে। সেখানে দু'চার দিন বিশ্রাম করে। তারপর তাঁবু গুটিয়ে ওরা চলে যায়।—ধীরে ধীরে বলতে লাগলেন বৃদ্ধ বুহিরা।

হঠাৎ আমার নজর পড়লো সেই আরবী কাফেলার একটি বালকের ওপর। এমন সুন্দর সুদর্শন বালক আমি জীবনে আর কখনও দেখিনি। যেন নূরের জ্যোতি তাঁর সারা চোখে-মুখে উপচে পড়ছে।

সেদিন প্রখর রোদের তাপে মরুভূমি যেন জ্বলে যাচ্ছিলো। অথচ আমি অবাক হয়ে দেখলাম, একখণ্ড মেঘ সে কাফেলাটির মাথার ওপর স্থির থেকে তাদের ছায়া দিচ্ছে। কিছুক্ষণ পর বালকটি গির্জার কাছাকাছি কূপে পানি আনতে গেল। আর মেঘখণ্ডও তাঁর সাথে সাথে ছায়া দিতে দিতে এগিয়ে এলো। এ অলৌকিক ঘটনা থেকে আমার মনে হলো, এ বালক নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌র কোন পিয়ারা বান্দা। তা না হলে মেঘ কেন তাঁকে সারা পথ ছায়া দিয়ে প্রচণ্ড রৌদ্রতাপ থেকে রক্ষা করবে?

বুহিরা বলে গেলেন ধীরে ধীরে,—আমি তাড়াতাড়ি কাফেলার সরদারের কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করলাম—'কে এই সুদর্শন বালক, যাঁর প্রতি আল্লাহ্‌তা'আলা এত মেহেরবান, যাঁকে রোদের তাপ থেকে রক্ষা করছে আকাশের মেঘ?'

আরবী দলপতি বললেন—'এটি আমার পুত্র। আমার সংগে বাণিজ্যে যাচ্ছে দূর দেশে।'

সাধু বুহিরা সসম্ভ্রমে জিজ্ঞেস করলেন—'আপনার ধর্ম কি?'

ঃ আমাদের ধর্ম মূর্তিপূজা। আমরা কাবা মন্দিরে রক্ষিত দেবদেবীর পূজা করি আর স্বাধীনভাবে জীবনযাপন করি।'—বললেন হাসিমুখে কাফেলার সরদার।

বুহিরা গৌরকান্তি বালকের কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করলেন—'আপনার ধর্মও কি তাই?'

উত্তরে বালক বললেন—'না, আমি মূর্তিপূজা করি না। আমার অন্তর এক অজানা সত্যের সন্ধানী। আমি তাঁরই প্রতীক্ষায় আছি। তবে, এক আল্লাহ্ ব্যতীত আর কারও ইবাদত করি না। আর যারা মূর্তি ও দেবতার পূজা করে, তারা কেউ সৎ পথে নেই, একথা আমি মনেপ্রাণে বিশ্বাস করি।'

বালকের জ্ঞানগর্ভ কথা শুনে আমার দিব্যদৃষ্টি খুলে গেল। আমার মনে হলো, আমি যেন সত্যের সন্ধান পেয়েছি। এক আল্লাহ্ ছাড়া আর কোন মা'বুদ নেই।—আবেগ ভরা কণ্ঠে বলে গেলেন বুহিরা।

যখন আমি জানতে পারলাম, কাফেলাটি হেরা পর্বত এলাকা থেকে এসেছে, তখন আমার বিশ্বাস আরো দৃঢ় হলো যে, এ

বালক প্রতিশ্রুত শেষ নবী না হয়ে পারে না। কারণ, আসমানী কিতাব মতে আল্লাহ্ তাঁর শ্রেষ্ঠ ও শেষ নবী হেরা পর্বতের পাশের অঞ্চলেই পাঠাবেন।

একটু থেমে বলতে লাগলেন বুহিরা,—'তবে আমার মনে একটু খটকা রয়ে গেল এই কারণে যে, আসমানী কিতাব মতে আল্লাহ্র শেষ নবী এতীম হবেন। অথচ এ বালক ত' এতীম নয়! আমি আবার দলপতির কাছে গিয়ে বললাম—এ বালক কি সত্যিই আপনার পুত্র?'

জবাবে তিনি একটু ইতস্তত করে বললেন—'না, সে আমার ভাইয়ের পুত্র। ভাই ইন্তিকাল করেছেন। আমিই তাকে আপন পুত্রের মত লালন-পালন করছি। আমি তার চাচা আবু তালিব।'

সরদারের কথা শুনে আমার সমস্ত শরীর আনন্দে কাঁপতে লাগলো। আমার মনে আর কোন সন্দেহ রইলো না যে, আল্লাহ্র প্রতিশ্রুত মহান নবীর আবির্ভাব হয়েছে। এই বালকই শেষ যমানার শেষ নবী। ইনিই পরবর্তীকালে পথভোলা বিধর্মী মানব জাতিকে সত্য পথের সন্ধান দেবেন।

কান্না-ভেজা কণ্ঠে বুহিরা বললেন—'আমি সেই কাফেলার অনেক খাতির-যত্ন করি। তিন দিন পর তারা বিদায় নিয়ে

চলে গেলেন। কিন্তু আজ এত বছর যাবত বহু কাফেলা এসে আমার এ বাগানে আস্তানা ফেলেছে, কিন্তু সে সুদর্শন মহান বালকের কাফেলা আর এ পথে আসেনি।

'প্রিয় সালমান! তুমি যদি সেই মহা মানবের দেখা পেতে চাও, তবে মরু পথ ধরে দক্ষিণ দিকে যাত্রা কর। আমার কাছে তোমার সত্যের সন্ধান মিলবে না। একমাত্র তিনিই তোমাকে সত্য-পথের সন্ধান দিতে পারবেন। আমি এখন বৃদ্ধ। চলাফেরার শক্তি নেই, নয়তো আমি নিজে সে মহা মানবের সন্ধানে তোমার সংগে যেতাম। তাঁকে দেখে জীবন ধন্য করতাম।'—অশ্রুসজল কণ্ঠে বললেন বৃদ্ধ বুহিরা।

যাকারিয়া ও সালমান (রা.)

চঞ্চলচিত্তে পথ চলেছেন হযরত সালমান ফারসী (রা.)। তাবুক শহর পেরিয়ে দীর্ঘদিন পরে পৌঁছলেন তিনি বনি গাচ্ছান এলাকায়। পথে চোর-ডাকাতদের হাতে বহুবার পড়েছেন তিনি। ডাকাতরা তাঁর পরনের জামা-কাপড় লুট করে নিয়েছে। সংগের সামান্য ছাতু ও খেজুর পর্যন্ত নিয়ে গেছে মারধর করে।

হযরত সালমান ফারসী (রা.)

সম্পূর্ণ অসহায় অবস্থায় পথিক সালমান এক অচেনা মরূদ্যানে উপস্থিত হলেন। কবিলার খৃস্টান দলপতি তাঁর খুব খাতিরদারী করলো এবং আন্তরিকভাবে উপদেশ দিল—'আপনি যদি কোন অতি পরহেযগার মহাসাধকের সন্ধানে থাকেন, তবে দু'মাতুল জংগল থেকে কিছু দূর এগিয়ে গেলে এক পাহাড়ী এলাকা পাবেন। সেখানে এক নির্জন গুহায় যাকারিয়া নামে এক বুজুর্গ বাস করেন। তিনি একজন মস্ত বড় আলিম। হয়তো তাঁর সোহবতে আপনি হিদায়ত পাবেন। তবে, তিনি কারো সাথে কথা বলেন না। দিনরাত আল্লাহ্‌র ধ্যানে মগ্ন থাকেন।'

চলতে চলতে দীর্ঘ মরুপথ পাড়ি দিয়ে সালমান হাযির হলেন সেই পাহাড়ী এলাকায়। খুঁজে বের করলেন সেই গুহা। গুহার মুখে এক বৃদ্ধ ব্যক্তি গভীর ধ্যানে মগ্ন। সাদা চুল ও মুখের সাদা লম্বা দাড়ি তাঁর অর্ধেক শরীর ঢেকে ফেলেছে। হাত-পায়ের নখ বড় বড়। গায়ের চামড়া ঝুলে পড়েছে। তাঁর আশেপাশে বুনো হরিণরা নির্ভয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

সালমান (রা.) আদবের সংগে বৃদ্ধ যাকারিয়ার সামনে গিয়ে বসলেন। বৃদ্ধের ঠিক মুখোমুখি। কিন্তু তিনি একবারও চোখ মেলে চাইলেন না। সকাল গড়িয়ে দুপুর হলো, তারপর রাত। সালমান নীরব নির্বাক হয়ে বসে আছেন তাঁর সামনে।

রাত গড়িয়ে ভোরের আলো দেখা দিল। হঠাৎ বৃদ্ধ মাথা উঠালেন। ঝোলা থেকে তিন-চারটা খেজুর নিয়ে খেলেন। তারপর পাশের একটা কুঁজো থেকে পানি ঢেলে পান করলেন। তারপর আবার চোখ বুঁজে ধ্যানস্থ হলেন।

এবার আরো তিন-চার ঘন্টা কেটে গেল। এক সময় একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছেড়ে চোখ মেলে চাইলেন সাধক। তীব্র দৃষ্টি মেলে তাকালেন সালমানের দিকে। তারপর রাগত স্বরে বললেন—'আমি পঞ্চাশ বছর যাবত এ জায়গায় বসে আছি। কোন দিন কেউ আমাকে বিরক্ত করতে আসেনি। তুমি কেন এমন উৎপাত করছো আমার ওপর? তুমি কি চাও, আমি অন্যত্র চলে যাই, আর তুমি আমার স্থান দখল করো?'

সালমান বিনীতভাবে বললেন, 'হুযূর, সত্যের সন্ধানে দিশেহারা হয়ে আমি সারা মরু অঞ্চল ঘুরে ফিরেছি। বহু সাধু পুরুষের কাছে দীক্ষা চেয়েছি; কিন্তু কেউ আমাকে সত্যের সন্ধান দিতে পারে নি। আপনি আমাকে সাহায্য করুন।'

বৃদ্ধ যোশের সংগে জবাব দিলেন—'মানুষ সত্য ধর্ম ত্যাগ করে মূর্তিপূজা শুরু করেছে। মাটির মানুষকে তারা আল্লাহ্‌র শরীক করে তার ইবাদত করতে আরম্ভ করেছে। আসল ধর্ম হচ্ছে—একমাত্র আল্লাহ্‌কে প্রভু মনে করা আর শুধু তাঁরই

ইবাদত করা। হযরত আদম (আ.), হযরত মূসা (আ.), হযরত ইবরাহীম (আ.), হযরত ইসমাঈল (আ.), হযরত দাউদ (আ.), হযরত লুত (আ.), হযরত ঈসা (আ.) সকল পয়গম্বরই বিভিন্ন যমানায় এই তৌহীদের বাণী প্রচার করে গেছেন। একমাত্র আল্লাহ্‌র ইবাদতই সত্য ধর্ম, আর সমস্ত মতবাদই মিথ্যে।'

একটু থেমে বৃদ্ধ পুনরায় বললেন—'তুমি যদি প্রকৃত সত্য-ধর্ম জানতে চাও, তবে দক্ষিণ দিকে হেজাজ অঞ্চলে চলে যাও। সেখানে আল্লাহ্‌ তাঁর শেষ পয়গম্বর পাঠাবেন। তাঁর নবুয়তের তিনটি লক্ষণ দেখতে পাবে। (১) তিনি মক্কা থেকে ইয়াসরেবে (মদীনা) হিজরত করবেন, (২) তাঁর পিঠে নবুয়তের মোহর অংকিত থাকবে, (৩) তিনি সদকা বা দানের জিনিস গ্রহণ করবেন না, তবে হাদিয়া বা উপঢৌকন কবুল করবেন।'

'আমাকে তুমি আর অযথা বিরক্ত করো না। আগামীকাল ভোরের আগেই আমি ইহলোক ত্যাগ করবো।'—একথা বলেই বৃদ্ধ সাধক চোখ বন্ধ করলেন।

এভাবে দুপুররাত অতিবাহিত হলো। এমন সময় তাপস যাকারিয়া সটান পা ছড়িয়ে শুয়ে পড়লেন। তারপর সালমানের পানে তাকিয়ে একটু হেসে বললেন—'আমি এখন বিদায় নিচ্ছি। আল্লাহ্‌-পাক আমার দাফন-কাফনের জন্য তোমাকে পাঠিয়েছেন।

মনে রেখো, আমার মৃত্যুর পর টাটকা পানি দিয়ে আমাকে গোসল দেবে। আমার গায়ের চাদরখানা ধুয়ে তা দিয়ে কাফন পরাবে। আর আমি যে জায়গাটিতে এত বছর বসে ইবাদত করেছি, সেখানেই আমাকে দাফন করবে।'

তারপর একটু মলিন হেসে বললেন—'তুমি সাক্ষী থেকো পথিক, আমি এক আল্লাহ্ ও তাঁর সর্বশেষ নবীর ওপর ঈমান এনে দুনিয়া থেকে বিদায় নিচ্ছি।'

একথা বলার সংগে সংগে বৃদ্ধ শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন।

সালমান ফারসী (রা.) বৃদ্ধের নির্দেশ মত তাঁকে দাফন করলেন। তারপর অন্তরে বিপুল আশা ও আকুলতা নিয়ে হেজাজের পথে রওয়ানা হলেন। মনে দৃঢ় বিশ্বাস, বৃদ্ধ বয়সের প্রচেষ্টা তাঁর বৃথা যাবে না। আল্লাহ্ তাঁকে তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ নবীর দরবারে অবশ্যই পৌঁছাবেন।

সামাউনের কবলে সালমান (রা.)

সাধক যাকারিয়ার কতগুলো বকরী ছিল। ওরা নির্ভয়ে বনের বাঘ-ভালুকের সংগে ঘুরে বেড়াতো। সাধু যাকারিয়া কখনো কখনো বকরীগুলোর দুধ পান করতেন।

তাঁর মৃত্যুর পর সালমান ফারসী (রা.) বকরীগুলো সংগে নিয়ে বনি কালব গোত্রে এসে শুনলেন, সেখান থেকে একটি ছোট্ট কাফেলা হজ্জ ও কাবাগৃহের মূর্তি দর্শনের উদ্দেশ্যে মক্কা যাচ্ছে। সালমান ফারসী (রা.) ভাবলেন, এই সুযোগে কাফেলার সংগে যাত্রা করলে তিনি হেরা অঞ্চলে পৌঁছে যাবেন। আর ভাগ্য প্রসন্ন হলে আল্লাহ্‌র প্রতিশ্রুত শেষ নবীর দেখা পাবেন সেখানে।

তক্ষুণি কাফেলার দলপতি আমেরকে গিয়ে বললেন—'সরদার, আপনি যদি আমাকে সংগে নেন, তবে হযরত যাকারিয়ার সমস্ত বকরী আপনাকে উপহার দেব। মৃত্যুকালে তিনি আমাকে এগুলো হাদীয়া দিয়ে গেছেন।'

এতগুলো বকরী পাবে ভেবে খুব খুশি হলো দলপতি। সে তখন তার উটের পিঠে তুলে নিলো সালমান ফারসী (রা.)-কে।

কাফেলা চলছে ধু ধু মরুভূমির তপ্ত বালুর ওপর দিয়ে। ঢং ঢং

শব্দে বাজছে উটের গলার ঘন্টা। তার সাথে দফ বাদ্য বাজিয়ে গান গাচ্ছে সওয়ারীরা।

সালমানের অন্তর আনন্দে বাগবাগ। তাঁর এতদিনের সযত্নে লালিত স্বপ্ন বুঝি এবার সত্য হতে চলছে। উত্তেজনায় চঞ্চল তাঁর সারা শরীর।

চলতে—
চলতে—
চলতে—

কাফেলা থামলো এসে হেজাজ মুলুকের ওয়াদিউল কুরা নামক স্থানে। সেখানে সাত দিনের অবস্থান আর বিশ্রাম। কুরায় একদিন সালমান ফারসী (রা.) দেখলেন, কাফেলার দলপতি আমের সামাউন নামে এক ইহুদী গোত্রের সরদারের সংগে কি সব শলা করছে। আলাপ শেষে সামাউন এক থলে রৌপ্যমুদ্রা আমেরকে প্রদান করলো।

বিদায়ের দিন আমের বললো, 'সালমান, আপনি সামাউনের সাথে ওর বাড়ি যান এবং কিছু রসদপত্র নিয়ে আসুন।'

সামাউনের বাড়ি পৌঁছলে সে সালমানকে নানা অজুহাতে সারাদিন বসিয়ে রাখলো। সন্ধ্যার সময় ক্রুদ্ধকণ্ঠে বললো— 'সালমান, তুমি মক্কা যাওয়ার ইচ্ছা ত্যাগ করো। কারণ, তোমার মনিব আমের তোমাকে আমার কাছে উচ্চ মূল্যে বিক্রয় করে

গেছে। এখন থেকে তুমি আমার ক্রীতদাস। আমার অনুমতি ছাড়া তুমি কোথাও যেতে পারবে না। আজ থেকে আমার সংসারে তোমাকে গোলামের কাজ করতে হবে।

দুষ্ট দলপতি আমেরের বেঈমানীতে ভেঙে পড়লেন বৃদ্ধ সালমান। তাঁর মক্কায় পৌঁছার খোয়াব শেষ হয়ে গেছে। দুর্বল শরীর নিয়ে তাঁকে বাকি জীবন ইহূদী সামাউনের গোলামি করতে হবে। অথচ তিনি আমেরের গোলাম ছিলেন না মোটেই।

সন্ধ্যার পর ইহূদীটির বাড়িতে গোত্রের সব লোক এসে জমায়েত হলো। ওরা সালমানকে বাবলা কাঁটার তৈরি টুপি পরিয়ে দিয়ে বললো—'আমরা খৃস্টানদের মনে-প্রাণে ঘৃণা করি। তুমি আমাদের খৃস্টান গোলাম। আমরা খৃস্টধর্মের প্রতি আমাদের আক্রোশ তোমার ওপরই মেটাবো।' একথা বলে লোকগুলো মাতাল হয়ে নাচ জুড়ে দিলো আর একটা ভারী মুগুর দিয়ে সালমানকে প্রহার করতে লাগলো।

প্রহারের ফলে সালমানের সারা শরীর জখম হলো। তাজা খুনে শরীর ভিজে গেল। টুপির কাঁটা তাঁর মাথায় বিদ্ধ হয়ে তাঁকে বেহুঁশ করে ফেললো। ইহূদীরা তাঁকে মৃত ভেবে একটি গর্তে ফেলে দিলো আর গর্তের মুখে পাথর চাপা দিয়ে মহা ফুর্তিতে যে যার বাড়ি চলে গেল।

জ্ঞান ফিরে এলে হযরত সালমান ফারসী (রা.) দেখতে পেলেন, জালিম সামাউন তাঁকে গর্ত থেকে বের করে এনেছে। তার বাড়িতে এনে বললো, 'এখন থেকে তোমাকে আমার ঘর-দোর ঝাট দিতে হবে, জংগল থেকে লাকড়ি কেটে আনতে হবে। বাসন-কোসন, কাপড়-চোপড় ধুতে হবে। খেজুর পাড়তে হবে। লোকেরা তোমাকে মারপিট করলেও আমি তোমাকে মরতে দিতে পারি না। কারণ, তোমার মত একজন বিশ্বস্ত গোলামের আমার প্রয়োজন।'

যন্ত্রণায় কাতর হযরত সালমান ফারসী (রা.) বিনীতভাবে বললেন, 'আপনি আমার বৃদ্ধ বয়স ও দুর্বলতা স্বচক্ষেই দেখতে পাচ্ছেন। আমি এই হাড় জিরজিরে দুর্বল শরীর নিয়ে কেমন করে এসব কাজ করবো? এ বৃদ্ধ বয়সে কেমন করে খেজুর গাছে উঠে খেজুর পাড়বো, আর গাছ পরিষ্কার করবো?'

তাঁর মিনতিতে সামাউনের প্রাণে কোনরূপ দয়ার সঞ্চার হলো না। সে রাগত স্বরে বলতে লাগলো—'ওসব অজুহাত শুনতে চাই না। কাজে যদি কোনরূপ গাফলতি দেখি, তাহলে তোমাকে গত রাতের মত আবার মুগুর পেটা করবো। তুমি কখনো পালাতে চেষ্টা করবে না। সেরূপ করলে আমার লোকেরা তোমাকে খুঁজে বের করে আনবে, আর তখন পাথর মেরে তোমাকে হত্যা করবে।'

নীরবে গোলামের কাজ করতে লাগলেন সালমান। সারাদিন একটানা খাটেন। কোন বিশ্রাম নেই। এমন কোন দিন যায় না যে, খেজুর গাছ থেকে পড়ে আহত হন না। তা সত্ত্বেও বিনা কারণে রোজ সামাউন ও তার স্ত্রী সালমানকে মারধর ও অকথ্য ভাষায় গালাগালি করে।

ওয়াদিউল কুরার ওপর দিয়ে মক্কা যাওয়ার পথ। সিরিয়া ও বসরার কাফেলা এ পথ দিয়েই যাতায়াত করে। একদিন মাইলটাক দূরে ঝরনা থেকে পানি আনতে গিয়ে সালমান ফারসী (রা.) শুনলেন, কাফেলার লোকজন বলাবলি করছে ঃ

মক্কা শরীফে মুহাম্মদ (স.) নামে এক ব্যক্তি নিজেকে পয়গম্বর বলে দাবী করেছেন। অতি অমায়িক ও বিশ্বাসী তিনি। এক সম্মানিত বংশে তাঁর জন্ম। দীর্ঘ সময় হেরা পর্বতের গুহায় ধ্যান মগ্ন থাকেন, আর মানুষকে এক আল্লাহ্‌র ইবাদত করতে উৎসাহিত করেন। তাঁর আহ্বানে মক্কার কিছু লোক আল্লাহ্‌র ওপর ঈমান এনেছে। তারা মূর্তিপূজা ছেড়ে দিয়ে মুহাম্মদ (স.)-এর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছে। তবে অনেকে তাঁর ঘোর বিরোধিতা করছে। তাদের ধর্মের নিন্দা করার জন্য পদে পদে তাঁকে লাঞ্ছিত করছে।

কিছুদিন পরে আরো অনেক কাফেলার সাক্ষাৎ পেলেন সালমান ফারসী (রা.)। তাদের কাছে শুনলেন, হযরত মুহাম্মদ (স.) শুধু

মূর্তিপূজার বিরুদ্ধে লোকদের হিদায়ত করেই ক্ষান্ত হচ্ছেন না, তিনি নির্ভীক কণ্ঠে প্রচার করছেন—মানুষে মানুষে কোন ভেদাভেদ নেই। আল্লাহ্‌র চোখে সব মানুষই সমান। ভূমিষ্ঠ কন্যা সন্তানকে মাটিতে পুঁতে ফেলা, চুরি-ডাকাতি ও দস্যুবৃত্তি করা, গোত্রে গোত্রে বংশ-পরম্পরায় খুনখারাবি করা, মেয়েদের বেইজ্জত ও অমর্যাদা করা মহাপাপ।

তাঁর এমন সত্য ও ন্যায়ের বাণী শুনে দিন দিন তাঁর শিষ্য সংখ্যা বেড়ে চলেছে। আর অপর দিকে দুর্ধর্ষ কুরায়শরা ভীষণ-ভাবে ক্ষেপে উঠেছে তাঁর বিরুদ্ধে। তারা পদে পদে তাঁকে ও তাঁর সাহাবীদের ওপর অকথ্য জুলুম চালাচ্ছে। এমন কি তাঁকে জানে খতম করার জন্য ষড়যন্ত্র করছে।

এদিকে আরো নির্মম হয়ে উঠেছে সামাউন আর তার পরিবারের লোকজন। তারা অকারণে যখন-তখন অপদস্ত ও মারপিট করছে বৃদ্ধ সালমান ফারসী (রা.)-কে।

একদিন সামাউনের এক বন্ধু শোয়াইব তাঁকে এত জোরে তরবারি দিয়ে আঘাত করলো যে, তিনি সংগে সংগে বেহুঁশ হয়ে পড়ে গেলেন। তাঁর সারা শরীর রক্তে রঞ্জিত হয়ে উঠলো।

দিনের পর দিন, মাসের পর মাস এমনিভাবে অতিবাহিত হয়ে যাচ্ছে। রসূলে করীম (স.)-এর দরবারে হাযির হওয়ার জন্যে

পাগল-পারা হয়ে উঠেছেন হযরত সালমান ফারসী (রা.)। অথচ মুক্তির কোনো উপায় নেই। অর্থের অভাবে সামাউনকে মুক্তিপণ দিয়ে রেহাই পাওয়ারও কোনো ব্যবস্থা নেই।

এদিকে তিনি মক্কা ফেরত কাফেলাদের কাছে নিয়মিত খবর পাচ্ছেন আল্লাহ্‌র রসূলের। কাফেরদের অসহ্য অত্যাচারে অতিষ্ঠ মক্কার কিছু সংখ্যক নও-মুসলিমকে আশ্রয় দিয়েছেন আবিসিনিয়ার রাজা তাঁর রাজ্যে। কেউ কেউ হিজরত করেছেন মদীনায়।

এদিকে দিন দিন মুসলমানদের সংখ্যা বেড়ে যাচ্ছে দেখে জালিম কুরায়শদের জুলুম আরো বেড়ে গেছে। হয়তো তিনিও নিরুপায় হয়ে মদীনা শরীফে হিজরত করতে বাধ্য হবেন।

মহানবী (স.) ও সালমান (রা.)

মহানবী (স.)-এর ইসলাম প্রচারের খবর লোকমুখে ওয়াদিউল কুরাতে ইহূদীদের কানেও গিয়ে পেঁছিলো। একদিন সামাউন তার পুত্র হিরোন ও কন্যা হরদিয়াকে মক্কায় পাঠিয়ে দিলো—নবীর সম্বন্ধে বিস্তারিত খবর সংগ্রহের জন্যে। হরদিয়া ছিলো অত্যন্ত গোঁড়া ইহূদী। যাবার বেলায় সে তার পিতাকে দৃঢ়কণ্ঠে বলে গেলো, মক্কার নতুন ধর্ম প্রচারকটি যদি ইহূদী ধর্মের বিরুদ্ধে কোনো কথা বলে, অথবা তাঁর ডাকে যদি কোনো ইহূদী সে ধর্ম গ্রহণ করে, তা হলে তাঁকে হত্যা করতে সে ইতস্তত করবে না।

মক্কায় পেঁছে হরদিয়া শুনতে পেলো, রসূলুল্লাহ্ (স.) খৃস্টানদের নবী হযরত ঈসা (আ.)-কে মন্দ বলেন না, বরং তাঁকে আল্লাহ্র এক বিশিষ্ট নবী বলে সম্মান করেন। তবুও তার বিদ্বেষী ক্রোধ নবীজীর ওপর গিয়ে পড়লো। কয়েকবার সে গোপনে খঞ্জর হাতে তাঁকে হত্যা করতে কোশেশ করলো, কিন্তু প্রতিবারই তার সে চেষ্টা ব্যর্থ হলো।

বারবার বিফল হয়ে হরদিয়ার জিদ আরো বেড়ে গেল।

এ সময় আইউব নামে মদীনার এক ইহূদী যুবক হরদিয়াকে বিয়ের প্রস্তাব দিলো। হরদিয়া যুবকটিকে বললো, 'আরবের নতুন নবী আমাদের ধর্মের সমালোচনা করে এক নতুন মতবাদ প্রচার করছে, তুমি যদি তাকে কতল করতে পারো, তবেই আমি তোমাকে পতিরূপে গ্রহণ করতে রাজী আছি।'

ইহূদী যুবক আইউব তার শর্তে রাজী হলো আর হরদিয়া তার ভাই হিরোনকে নিয়ে মদীনায় চলে এলো। হরদিয়া মনে মনে ভাবলো, মদীনায় বহু ইহূদীর বাস। সেখানে মুসলিমদের সংখ্যা অতি নগণ্য। সুতরাং নবীজী সেখানে আসার পর আইউবের পক্ষে তাঁকে কতল করা মোটেই কঠিন হবে না।

এদিকে দীর্ঘদিন কেটে যাওয়ায় সামাউন পুত্র-কন্যার জন্য অধীর হয়ে উঠেছে। তার মনে হলো, বৃথাই তারা এতকাল মক্কা ও মদীনায় পড়ে আছে। ওদের উদ্দেশ্য হয়তো সফল হবার নয়। একদিন সে হযরত সালমান ফারসী (রা.)-কে কাছে ডেকে বললো— 'সালমান, তুমি আমার অতি বিশ্বস্ত দাস। তুমি মদীনায় যাও। হিরোন আর হরদিয়াকে বুঝিয়ে বাড়ি নিয়ে এসো। আমি মহা ধুমধামে আইউবের সংগে হরদিয়ার বিয়ে দিতে চাই। আমি বৃদ্ধ হয়ে গেছি। হরদিয়াকে অবিবাহিত রেখে আমি মনে শান্তি পাচ্ছি না।'

হযরত সালমান ফারসী (রা.)

রসূলে করীম (স.) মক্কাবাসীদের জুলুমে অতিষ্ঠ হয়ে মদীনায় হিজরত করবেন। এদিকে সামাউন তাঁকে মদীনা যেতে বলছে। আহা, কি সৌভাগ্য তাঁর! তিনি এত বছর পর তাঁর প্রিয় নবী (স.)-এর দেখা পাবেন। তাঁর মুখে শুনতে পাবেন সত্যের অমিয় বাণী—যাঁর জন্য তিনি এতোকাল অধীর আগ্রহে প্রতীক্ষা করছেন। এক মহা পুলকে সালমান বারবার শিহরিত হতে লাগলেন।

আনন্দ আর উত্তেজনায় তাঁর সারারাত ঘুম এলো না। খুব ভোরে উঠেই রওয়ানা দিলেন মদীনার পথে। মদীনায় আইউবের বাড়ি পৌঁছে সালমান শুনতে পেলেন, সবার মুখে একই আলোচনা—হযরত রসূলে করীম (স.) মক্কা থেকে হিজরত করে মদীনায় যাত্রা করেছেন। নব দীক্ষিত আনসার ও তাদের ছেলেমেয়েরা নিজ নিজ বাড়ি-ঘর সাজাচ্ছে নবীজীকে অভ্যর্থনা জানাতে। কেউ কেউ মরু পথ ধরে এগিয়ে গেছে সত্যের দিশারীকে সাদর সম্ভাষণ জানাতে।

একদিন হযরত সালমান ফারসী (রা.) আইউবের খেজুর বাগানে কাজ করছিলেন। তিনি গাছে উঠলেন পাকা খেজুর পাড়তে। এমন সময় একজন ইহুদী এসে খবর দিলো, মক্কার নতুন ধর্ম প্রচারক হযরত মুহাম্মদ (স.) মদীনা পৌঁছে গেছেন এবং সকলকে বলেছেন—'আমি আল্লাহ্‌র রসূল। তোমরা শিরক ত্যাগ করে একমাত্র আল্লাহ্‌র ইবাদত কর।'

একথা শুনতে পেয়ে দূর পথের দিকে তাকিয়ে দেখলেন সালমান। খেজুর গাছের মাথা থেকে অনেক দূর অবধি তাঁর দৃষ্টিগোচর হলো। হ্যাঁ, সত্যের দিশারী কিছু সংখ্যক অনুসারী সংগে করে মদীনায় প্রবেশ করছেন।

আনন্দে দিশাহারা হয়ে কাঁপতে লাগলেন সালমান (রা.)। মনে হলো উত্তেজনায় এই বুঝি গাছ থেকে পড়ে যাবেন। গাছ থেকে নেমে কিছু খেজুর হাতে নিয়ে ছুটলেন নবীজী (স.)-কে সালাম জানাতে।

সারা জীবনের স্বপ্ন সত্য হলো সালমান ফারসী (রা.)-এর। আল্লাহ্‌র সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ নবীর সাক্ষাৎ পেলেন তিনি। একটা খেজুর পাতার চাটাইয়ের ওপর বসে আছেন আল্লাহ্‌র নবী (স.)। তাঁর গৌরকান্তি শরীর থেকে নূরের জ্যোতি যেন ঠিকরে পড়ছে। মহাপুরুষ বিনম্রকণ্ঠে কথা বলছেন লোকজনের সাথে। অবাক বিস্ময়ে অনেক্ষণ তাঁর দিকে চেয়ে থাকলেন সালমান (রা.)। আনন্দ-আতিশয্যে কথা বলার শক্তি তিনি হারিয়ে ফেলেছেন।

কিছুক্ষণ পর নিজেকে সামলে নিলেন হযরত সালমান ফারসী (রা.)। তাঁর মনে পড়লো সাধু যাকারিয়ার কথা। নবুয়তের প্রথম প্রমাণ তিনি পেয়ে গেছেন। নবীজী মক্কা থেকে মদীনায় হিজরত করেছেন।

এবার দ্বিতীয় লক্ষণ পরখ করতে চাইলেন সালমান (রা.)। তাঁর খেজুরের পাত্রটি সামনে রেখে বললেন—'হযরত! আমি একজন গরীব লোক। আমি সামান্য খেজুর 'সাদকা' স্বরূপ আপনার খিদমতে হাযির করছি। আপনি মেহেরবানী করে গ্রহণ করুন।'

নবীজী খেজুরের পাত্রটির দিকে হাত বাড়ালেন। কিন্তু সাদ্‌কার কথা শুনে হাত গুটিয়ে নিলেন এবং গরীব সংগীদের সেগুলো গ্রহণ করতে বললেন।

হযরত সালমান ফারসী (রা.) অবাক হয়ে গেলেন আল্লাহ্‌র রসূলের অপূর্ব ব্যবহার দেখে। প্রিয় নবীজীর মধ্যে নবুয়তের দ্বিতীয় নজিরও তিনি পেলেন। হযরত দান গ্রহণ করলেন না।

কিছুক্ষণ পরে সালমান ফারসী (রা.) আবার কিছু খেজুর নিয়ে নবীজীর সামনে হাযির হলেন। এবার বললেন—'হুযুর, এ খেজুর আপনার জন্য হাদিয়া (উপহার) এনেছি। আপনি মেহেরবানী করে গ্রহণ করুন।' নবীজী সানন্দে সে খেজুর গ্রহণ করলেন। নিজে কিছু খেলেন সংগীদেরও কিছু খেতে দিলেন।

মনেপ্রাণে হযরত সালমান (রা.) নবীজীর পরম ভক্ত হয়ে উঠেছেন। যখনই সুযোগ পান, নবীজীর দরবারে হাযির হন। তাঁর মুখে আল্লাহ্‌ পাকের পবিত্র নির্দেশাবলী শ্রবণ করেন।

এভাবে বেশ কিছুকাল অতিবাহিত হলো। নবীজীর সত্যতার তৃতীয় লক্ষণ 'মোহরে নবুয়ত' দেখার ইচ্ছে তখনও সালমান ফারসী (রা.)-এর মনে অদম্য। একদিন রসূলে পাক (স.) শুধু একটি চাদর গায়ে মসজিদে বসে আছেন। হযরত সালমান (রা.) ভাবলেন, ইয়া আল্লাহ্। আজ যদি নবীজীর 'মোহরে নবুয়ত' দেখতে পেতাম!

মহানবী (স.) সালমান ফারসী (রা.)-এর মনের বাসনা আল্লাহ্র অনুগ্রহে জানতে পারলেন আর নিজেই পিঠের ওপর থেকে চাদরখানা সরিয়ে ফেললেন।

অবাক বিস্ময়ে সালমান দেখতে পেলেন হযরতের পৃষ্ঠদেশে কবুতরের ডিমের মত এক টুকরো মাংসপিণ্ড। আল্লাহ্র নূরে যেন ঝলমল করছে। আর তার মধ্যে আরবী অক্ষরে লেখা রয়েছে 'মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্'--মুহাম্মদ আল্লাহ্র রসূল।

সালমানের এতকালের মনোবাসনা পূর্ন হলো। সাধু যাকারিয়ার বাণী সত্য হয়েছে। ব্যাকুলভাবে পবিত্র মোহরে নবুয়তে চুমু খেয়ে অঝোরে কাঁদতে লাগলেন সালমান ফারসী (রা.)।

রসূলে পাক স্নেহভরে তাঁকে সামনে বসিয়ে তাঁর পরিচয় জিজ্ঞেস করলেন। সালমান তার জীবন-কাহিনী আদ্যোপান্ত বর্ণনা করলেন। তাঁর সত্য সন্ধানে সারা জীবন উৎসর্গ করার কথা শুনে নবীজী খুবই বিস্মিত হলেন। সালমান রসূল (স.)-এর হাতে

সানন্দে ইসলাম গ্রহণ করলেন। হযরত রসূলুল্লাহ্ (স) তাঁকে তাঁর প্রিয় সাহাবীদের মধ্যে গ্রহণ করলেন অতি আদরের সংগে।

হযরত সালমান ফারসী (রা.) নবীজীকে বসরার দরবেশ বুহিরার কথাও বললেন, যে দরবেশের খেজুর বাগানে তিনি বাল্যকালে চাচা আবূ তালিবের সংগে কয়েকদিন অবস্থান করেছিলেন।

নবীজীর বাণিজ্যে যাওয়ার ঘটনা আদ্যোপান্ত মনে পড়লো। নবীজী দরবেশ বুহিরার কথা শুনে খুশি হলেন। কাফেলার লোকদের যে আন্তরিক খাতিরদারী করেছিলেন সাধু বুহিরা, সে কথাও উল্লেখ করলেন তিনি।

কিছুদিনের মধ্যে হযরত সালমান ফারসী (রা.) দূত মারফত চিঠি লিখলেন বুহিরাকে। জানালেন নবীজী (স.)-এর কথা আর তাঁর মহান ধর্ম ইসলামের কথা। সে সময় বুহিরা মৃত্যুশয্যায়। সালমানের চিঠি পেয়েই সাধু বুহিরা কলেমা পাঠ করে মুসলমান হলেন এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই ইন্তিকাল করলেন।

হযরত সালমান (রা.)-এর মুক্তি

হযরত সালমান ফারসী (রা.)-এর একান্ত ইচ্ছা সারাদিন সারারাত নবী করীম (স.)-এর খিদমতে পড়ে থাকেন। কিন্তু তাঁর সে উপায় কই? তিনি যে গোলাম। একদিন নবীজী তাঁর গোলামির কথা শুনে বললেন—'টাকা-পয়সা দিয়ে মুক্তির চেষ্টা করো। আল্লাহ্ই টাকা-পয়সার ব্যবস্থা করে দেবেন।'

কিছুদিনের মধ্যেই হযরত সালমান (রা.) হরদিয়া ও আইউবকে সংগে নিয়ে ওয়াদিউল কুরা ফিরে এলেন। আইউব ও হরদিয়ার বিয়ে হয়ে গেল মহা ধুমধামের সাথে। এখন সালমানের কাজের চাপও কম। আল্লাহ্র অনুগ্রহে সামাউন আর তাঁর ওপর কোনরূপ অত্যাচার করে না।

একদিন মুক্তির কথা তুললে সামাউন বললো--'সালমান, তোমাকে গোলামি হতে রেহাই দেব। তুমি স্বাধীনভাবে যেখানে ইচ্ছা চলে যেতে পারবে।'

কিছুদিন পর সামাউন ভাবলো, সালমান হয়তো চল্লিশ উকিয়া স্বর্ণ যোগাড় করে আযাদী পেয়ে যাবে। ফলে তাঁর

বাড়ির কাজ-কর্মের অসুবিধা হবে। এমন সচ্চরিত্র একজন গোলাম যোগাড় করা তার পক্ষে হয়তো আর সম্ভবও হবে না।

ইহুদীর নতুন শর্ত

বিশ্বস্ত ভৃত্য হাতছাড়া হবার ভয়ে ইহুদী তখন আর এক নতুন শর্ত আরোপ করলো। সালমান (রা.)-কে কাছে ডেকে বললো—'মুক্তি পেতে হলে তোমাকে আমার বাগানে তিনশত খোরমার চারা লাগাতে হবে, আর সেগুলো বড় হয়ে ফলবতী না হওয়া পর্যন্ত তোমাকে অপেক্ষা করতে হবে।'

সামাউন মনে মনে ভাবলো, তিনশত চারা বড় হয়ে সবগুলোতে ফল ধরতে হলে সাত আট বছর কেটে যাবে। তদ্দিন আর সালমান মুক্তি পাবে না।

দুটো শর্তই অতি কঠিন। মুসলমানরা তখনো খুব গরীব। এতো সোনা তারা কোথা থেকে যোগাড় করবে সালমানের জন্যে? দ্বিতীয়ত, ওয়াদিউল কুরার জমি এতো অনুর্বর যে, একশত চারা

লাগালে পঁচিশটির বেশি বাঁচে না। তাছাড়া, গাছগুলো বড় হয়ে ফলবতী না হওয়া পর্যন্ত মুক্তির কোনো আশা নেই।

মলিন বদনে হযরত সালমান (রা.) নবীজীর দরবারে হাযির হয়ে ইহূদী মনিবের শর্তের কথা বর্ণনা করলেন। নবীজী তাঁকে ভরসা দিয়ে বললেন—'চিন্তা করো না। আল্লাহ্ কাউকে কোনো বিপদে চিরদিন ফেলে রাখেন না।'

নবীজী তখনই সাহাবীদের তিনশত খেজুর চারা যোগাড় করে আনতে বললেন। তারপর তাঁদের সংগে নিয়ে নিজ হাতে চারাগুলো রোপণ করলেন ইহূদী সামাউনের বাগানে গিয়ে।

আল্লাহ্র অপার মহিমা। তিনশত চারার একটিও শুকিয়ে নষ্ট হলো না। বরং খুব তাড়াতাড়ি সেগুলো বড় হতে লাগলো। শুনলে অবাক হবে, অল্পকালের মধ্যেই চারাগুলো বড় হয়ে উঠলো। থোকা থোকা খেজুর ধরলো প্রতিটি গাছে। বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে গেলেন সালমান আর সাহাবীরা, অবাক হলো সামাউন নিজেও। তার প্রথম শর্ত পূরণ হয়ে গেছে। নবীজী (স.)-এর মুবারক হাতের ছোঁয়ায় কেমন একটা অলৌকিক ঘটনা ঘটে গেলো। তাজ্জব বনে গেলো কবিলার ইহূদীরা।

এবার নবীজী (স.) হযরত সালমান (রা.)-এর জন্য সোনা সংগ্রহের বিষয় চিন্তা করতে লাগলেন। ঘটনাচক্রে একদিন একজন

সাহাবা ডিমের পরিমাণ একটি স্বর্ণপিণ্ড নবীজী (স.)-কে উপহার দিলেন। নবীজী তখনই সালমানকে ডেকে পাঠালেন। তাঁর হাতে স্বর্ণপিণ্ডটি দিয়ে বললেন—'এই নাও, তোমার মালিকের শর্ত পূরণ করে আযাদী হাসিল কর।'

হযরত সালমান ফারসী (রা.) ভক্তিভরে আরয করলেন—'হুযূর, এত অল্প সোনায় কি হবে!' নবীজী বললেন—'যাও, অল্পতেই আল্লাহ্ বরকত দেবেন।'

পরদিন হযরত সালমান (রা.) সামাউনের বাড়ি ফিরে গেলে সে বিদ্রূপের সংগে বললো—'সালমান, বৃথাই তুমি আযাদীর কোশেশ করছো। কে তোমাকে চল্লিশ উকিয়া স্বর্ণ দেবে? এত বড় দানবীর দুনিয়ায় থাকলে কেউ আর পরের গোলামি করতো না।'

জবাবে সালমান ফারসী (রা.) বললেন—'আপনি চিন্তা করবেন না। এক মহা দানবীরের দুয়ায় আমি আপনার সোনা নিয়ে এসেছি।'

স্বর্ণপিণ্ডটি হাতে নিয়ে চমকে উঠলো সামাউন। এই বুঝি এত কালের গোলাম হাতছাড়া হয়ে যায়। তবে তার মনে হলো, এত ছোট স্বর্ণপিণ্ডে চল্লিশ উকিয়া হবে না।

ঃ এতে চল্লিশ উকিয়া হবে না। কর্কশ কণ্ঠে বললো সামাউন।

ঃ ওজন করে দেখুন।—সালমানের জবাব।

কন্যা হরদিয়াকে নিয়ে সামাউন বাটখারায় সোনার পিণ্ডটি

মেপে দেখলো। সোনার ওজন চল্লিশের জায়গায় একশ' উকিয়া হয়ে গেছে।

তাজ্জব হয়ে গেলো সামাউন আর তার কন্যা। আযাদ হয়েছে হযরত সালমান ফারসী (রা.)। মুক্তি পেয়ে আল্লাহ্ পাকের শোকর-গুজারী করলেন তিনি। পরদিন খুব ভোরে মদীনায় ফিরে নবীজী (স.)-এর খিদমতে হাযির হলেন।

আযাদী লাভ করেছেন হযরত সালমান ফারসী (রা.)। তাঁকে আযাদ দেখতে পেয়ে মহা খুশি রসূলে পাক (স.) নিজেও। এখন থেকে বাকি জীবন হযরত সালমান ফারসী (রা.) নবীজী (স.)-এর দরবারে পড়ে থাকলেন। দিনরাত মহান আল্লাহ্ পাকের ইবাদত করেন আর নবীজীর অমিয় বাণী শ্রবণ করেন। মহা এক আনন্দ আর প্রশান্তিতে এখন তাঁর মনপ্রাণ ভরপুর।

আল্লাহ্ দীর্ঘ জীবন দান করেছিলেন হযরত সালমান ফারসী (রা.)-কে। রসূলে করীম (স.)-এর ইন্তিকালের পরও কয়েক বছর জীবিত ছিলেন তিনি। তাঁর যুগ যুগ ধরে দীর্ঘ সাধনা সার্থক হয়েছে, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে সত্যের সন্ধান দিয়েছেন। তাঁকে নবীজীর একজন বিশিষ্ট সাহাবী হওয়ার মর্যাদায় মণ্ডিত করেছেন।

হযরত সালমান ফারসী রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহু তাই এক অমর নাম।